গাড়োয়াল হিমালয়ে কেদার ও বদরি বহু প্রাচীন তীর্থ। মহাভারতের যুগ থেকেই এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা। ভারতের অগণিত মানুষ এই দুর্গম তীর্থযাত্রায় তীর্থদেবতার কাঙ্ক্ষিত দর্শনলাভে ধন্য হতেন। চারধাম দর্শন তো সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনচর্যার অঙ্গই ছিল। গত জুন মাসে অক্ষয়তৃতীয়ায় কেদারের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল ভক্তদের দর্শনের জন্য। তখন কে-ই বা জানত কিছুদিনের মধ্যেই এক বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসবে! সে-প্রলয়ংকর কাণ্ডে শুধু তীর্থস্থানই বিধ্বস্ত হয়নি, অগণিত মানুষ কেদারের প্রাঙ্গণ থেকে মন্দাকিনীর প্রবল স্রোতে হারিয়ে গেছেন। বহু জনপদ নিশ্চিহ্ন। ওইসব বিপর্যস্ত উপদ্রুত এলাকায় প্রাণ হাতে নিয়ে ভারতের জওয়ানরা মানুষের উদ্ধারে নেমেছেন। অন্যদিকে যে-আশ্রমগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তীর্থযাত্রীরা, সেসব আশ্রমের বেশিরভাগই অবলুপ্ত হয়েছে। সেখানকার কর্মীরা অনেকেই যাত্রীদের উদ্ধার করতে গিয়ে ভেসে গেছেন জলস্রোতে। এই বিপুল বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি কত মানুষকে যে গৃহহীন, স্বজনহীন করেছে, উৎসবমুখর প্রাঙ্গণকে শ্মশানে পরিণত করেছে তার হিসেব নেই। হিমালয়ের সুখস্মৃতি শুধু নয়, রুদ্রের তাণ্ডবনৃত্যের ফল এই মহতী বিনষ্টিকে ঘিরে আজ মানুষের অনেক জিজ্ঞাসা। উত্তর কি নিহিত ইতিহাসের গর্ভে?

অথ মুখরমৌনতা

আনন্দতীর্থ

[লেখক উত্তরাখণ্ডের সন্ন্যাসী। প্রাণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়ে তিনি দেবভূমির মহিমা কীর্তন করেছেন। একইসঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ মনন লিপিবদ্ধ করেছে প্রকৃতির বুকের উপর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচার-অনাচারের কাহিনি। মেঘভাঙা বৃষ্টি ও গান্ধি সরোবরে ভাঙনের ফলে উত্তরাখণ্ডের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণগুলিও বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।]

বহুকথিত বহুশ্রুত কথাটি এখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সেই পায়ে চলার যুগে কেদারদর্শনে গিয়েছিল একদল গ্রামবাসী। শোণপ্রয়াগের কাছে তাদের দলের একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে, দলের অন্যতম উদারমনা এক যুবক তার সেবায় ব্রতী হয়ে পড়েছিল। বাঁচাতে পারেনি সহযাত্রীকে। সেখানেই মৃত্যু হল তার। স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতায় মৃতের যথাযথ সৎকারাদি করে কর্তব্যমুক্ত হল যুবকটি। তারপর দ্রুত চলল কেদারদর্শনে। গৌরীকুণ্ড থেকে চোদ্দো কিলোমিটার আরোহে সে যখন 'দেওদেখানি'-র সমতলভূমিতে পৌঁছল তখন তার দলের সহযাত্রীরা দর্শনাদি শেষ করে ফিরে আসছে। বেলা শেষ হয়ে আসছে দেখে যুবকটি দ্রুত পা চালায়। যখন সে মন্দিরপ্রাঙ্গণে পা রাখছে, তখন কোনও যাত্রী নেই। মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে, প্রাঙ্গণও নিস্তব্ধ। হতাশায় ভেঙে পড়ল যুবক।

সহসা সে দেখতে পেল পূজারি রাওয়ালজীকে। পূজারি আশ্বস্ত করে যুবককে—''এখন বিশ্রাম করো, প্রসাদ পাও, কাল সকালে দর্শন করবে কেদারনাথকে।''

''কাল সকালে? মন্দির এখনও বন্ধ হয়নি?'' আশ্বস্ত হয় যুবকটি। পূজারির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সে প্রসাদ পায়। গরম কম্বল পায়—ঘুমিয়েও পড়ে। অবশেষে নিশার অবসান হয়, যুবকটি দেখে পূজারি নেই, মন্দিরের দ্বার খোলা। সে এগিয়ে যায় মন্দিরের দিকে। প্রাণভরে কেদারনাথ দর্শন-স্পর্শন করে মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখে নিচের থেকে দলে দলে যাত্রীরা উঠে আসছে।

যুবকটির দেখা হয়ে যায় তাদেরই গ্রাম থেকে আসা একদল দর্শনার্থীর সঙ্গে। তারা সবিস্ময়ে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করে, ''কোথায় ছিলে বাছা? ছমাস ধরে তোমার বাড়ির সকলে যে ভীষণ চিন্তায় রয়েছে! তোমার সঙ্গীসাথি সব ফিরে গেল, আর তুমি কোথায় রয়ে গেলে এতদিন?''

যুবকটির মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। গতকাল সন্ধ্যা আর আজকের সকালের মধ্যে কেটে গেছে ছমাস? তাহলে কে সেই পূজারি? যিনি একটি

রাতের ভাবে ছমাস ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারেন?

শুধু কেদারনাথ নয়, বদরিনাথেও এমনই কিছু দর্শন হয়েছিল স্বামী প্রভবানন্দজীর। তুরীয়ানন্দজী ভৎর্সনা করে তাঁকে বলেছিলেন, ''অবনী, তুমি ঠাকুরকে চিনতে পারলে না?''

কেদারনাথ বদরিনাথ শুধুমাত্র তীর্থ নয়, এগুলি ধাম—যেমন কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন। এখানে ঈশ্বর নিত্য অধিষ্ঠিত। গুপ্তকাশীতে, ত্রিযুগীনারায়ণে এমনকী রুদ্রপ্রয়াগেও দেখেছি স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের বাড়ির অঙ্গনে দাঁড়িয়ে কেদারশৃঙ্গের উদ্দেশে জল অর্পণ করছেন। কেদারমণ্ডল আশুতোষের নিজের জায়গা। অনাদিকাল থেকে ওই শৃঙ্গ মানুষকে আকর্ষণ করে আসছে... মানুষের বিশ্বাস কেদারনাথ ও বিশ্বনাথ দর্শনে সাক্ষাৎ শিবদর্শন হয়। কেদারনাথকে স্পর্শ করে মানুষ শিবস্পর্শনের আনন্দ অনুভব করেন।

কেদারখণ্ডে শিব পার্বতীকে বলছেন,

''স্বর্গারোহগিরে মূর্ধ্নি স্থানং মে পরমং মহৎ।
অয়ং তীর্থময়ঃ শৈলো যত্রাহং সংস্থিতো ময়া॥
দর্শনাদেব পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।
নশ্যন্তে কিমু দেবেশি পূজনাৎ স্পর্শনাৎ তথা॥''
(২।২৮-২৯)

রুদ্রপ্রয়াগ তথা গুপ্তকাশী থেকেই শুরু হয়ে গেছে এই কেদারমণ্ডল। গুপ্তকাশীতে পঞ্চপাণ্ডব মহিষরূপী শিবকে পঞ্চখণ্ডিত করেন। সেই পঞ্চখণ্ডিত মহিষ থেকে পঞ্চকেদারের উৎপত্তি—কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, মদমহেশ্বর, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর। এপথেই পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানে চলে যান। কল্পেশ্বর পার হয়ে হেলাং, তারপরই যোশীমঠ। যোশীমঠের ওপরেই তপোবন বা গন্ধমাদন পর্বত—সাক্ষাৎ নারায়ণক্ষেত্র বদরিবন।

ব্রহ্মার বরে অবধ্য অসুর সহস্রকবচ এমন একহাজারটি কবচ পেয়েছিল যে, কোনও মানুষ একহাজার বছর তপস্যা করলে ওই সহস্রকবচের মাত্র একটি কবচকে নষ্ট করতে পারবে। দীর্ঘায়ু এবং স্বেচ্ছাচারী সেই অসুরকে বধ করতে নারায়ণ এমন একটি স্থান খুঁজছিলেন যেখানে একদিনের তপস্যায় হাজার বছরের তপস্যার ফল পাওয়া যায়। সেইসময়ে নারায়ণের কেদারমণ্ডলের কথা মনে হয়। একটি শিশুর ছদ্মবেশে তিনি মা গৌরীকে মোহিত করেন। গৌরী শিশুটিকে গৃহে নিয়ে আসেন। নারায়ণের লীলাকৌতুকে প্রসন্ন হয়ে মহাদেব পুত্রস্নেহে বিষ্ণুকে ওই কেদারমণ্ডলের কিছু অংশ দান করেন। বদরিনাথে তপ্তকুণ্ডের কাছে আদিকেদারেশ্বর মন্দিরটি এই ঘটনার সাক্ষীস্বরূপ।

নারায়ণের তপস্যায় সহস্রকবচের কবচগুলি একের পর এক ক্ষয় হতে থাকে। নশো নিরানব্বইটি কবচ ক্ষয় হলে সে সূর্যের কাছে প্রার্থনা শুরু করে। শরণাগতকে সূর্য আশ্রয় দেন। ওই অসুরই দ্বাপরে কর্ণরূপে জন্ম নেয় কুন্তীগর্ভে, সূর্যের বরে। তার অবশিষ্ট অন্তিম কবচটি নেওয়ার জন্য নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে আসতে হয়েছিল। মতান্তরে, ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের কাছ থেকে কবচটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে (২৯।৪১) উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—ওই অলকানন্দা আমার নিজের গঙ্গা, বদরিনাথ আমার স্থান—'মমাশ্রম'—''গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যাং মমাশ্রমম্।''

ওই কেদারমণ্ডলের নিচেই মা গৌরীর গৃহ। এখানেই মা মেনকা তাঁকে ডেকেছিলেন 'উ—মা' বলে। এখানকার প্রাকৃতিক কুণ্ডের উষ্ণজলের উৎস তাঁর স্নানজল। এখানেই গণেশের জন্ম। বস্তুত ভারতবর্ষের ধর্মীয় সংস্কৃতি এই অঞ্চলের সঙ্গে ওতপ্রোত। এই অঞ্চলে স্বর্গারোহণের পথে এসেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব। পঞ্চকেদার তাঁদের হাতে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ। বদরিনারায়ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পূজিত মূর্তি। এখানেই সরস্বতী নদীর তীরে পরাশরমুনি, ব্যাসের আশ্রম। এখানে তিনি ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করে গেছেন। এক হাজার বছর

পূর্বে আচার্য শংকর এসে এই দিব্যস্থানগুলি চিহ্নিত করেছেন, বদরিকাশ্রমে বসে তিনিও রচনা করেছেন তাঁর কালজয়ী প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য।

আর একটি তত্ত্ব মা গঙ্গা। স্কন্দপুরাণে শিব একাধিকবার এঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ভালোবেসে তিনি মাথায় ধরে আছেন এই পাপনাশিনীকে—'ভক্ত্যা ময়া ধৃতা শীর্ষে সর্বকল্মষনাশিনী।' পার্বতীকে বলেছেন,

''তদেতৎ পরমং ব্রহ্ম দ্রবরূপং মহেশ্বরি।
গঙ্গাখ্যাৎ যৎ পুণ্যতমং পৃথিব্যাম্ আগতং শিবে॥
গাং গতেতি ততো গঙ্গা নাম তস্যা বভূব হ।''

অর্থাৎ পরব্রহ্মের বিগলিত রূপ পুণ্যতম গঙ্গাবারি পৃথিবীতে এসেছেন। 'গাং গতা'—ধরায় নেমেছেন বলেই তাঁর নাম হয়েছে গঙ্গা।

এখানে কত যে গঙ্গা—কেদারগঙ্গা, গৌরীগঙ্গা, ধৌলীগঙ্গা, কালীগঙ্গা! গোমুখ-নিঃসৃত মা গঙ্গাই যেন বহুরূপে শিবের জটা থেকে মুক্ত হয়ে সহস্রধারায় 'চরৈবেতি' মন্ত্রে বয়ে চলেছেন সাগরদর্শনে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। স্বামীজীরও গঙ্গাপ্রীতির উচ্ছ্বসিত পরিচয় পাই তাঁর পরিব্রাজক গ্রন্থে—''গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি। বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম—সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই 'হর হর হর', দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর হর হর!!' '' শ্রীশ্রীমাও নিজমুখে গঙ্গাপ্রীতি ব্যক্ত করেছেন : ''আমার একটু গঙ্গাবাই ছিল।'' হিন্দুদের গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল পান শাস্ত্রবিহিত বাহ্যশুদ্ধি। গঙ্গাতীরে বাস এক পুণ্যবাসনা। আজ এগুলিই পরম্পরা। কারণ পুণ্যাত্মারা আচরণের দ্বারা তত্ত্বকেই প্রতিফলিত করতে আসেন। 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎ তদেবেতরো জনাঃ।'

উত্তরাখণ্ড দেবভূমি। আবহমানকাল ধরে হিমালয়ের পুঞ্জীভূত অধ্যাত্মচেতনাকে সমস্ত সাধক হৃদয়ের ধন বলে মনে করেছেন, হিমালয়কে উপযুক্ত সাধনক্ষেত্র বলে মনে করে এসেছেন। 'সাধন' হিসেবে বিবেচিত হতে হতে হিমালয় কখন অজান্তে নিজেই 'সাধ্য' হয়ে উঠেছে—সাধ্যসাধন এক হয়ে গেছে ভাবের গভীরতায়।

কিন্তু এই আস্তিকদর্শন, এই ভাবের মর্যাদা বাণিজ্যিক মূল্যের index-এ ধরা পড়ে না। তাই গঙ্গা-অলকানন্দার জলবিদ্যুৎকে সহজ পণ্য করার মাধ্যমে রাজ্যের বিকাশ চাইলেন সরকার। পাপহারিণী পুণ্যসলিলা স্বর্গীয় প্রবাহগুলিকে উচ্চমানের বিদ্যুতের 'resource' বলে তাঁদের মনে হল। উত্তরাঞ্চল (উত্তরাখণ্ড) জলবিদ্যুৎ নিগম (UJVN) একশোরও বেশি বাঁধ-এর পরিকল্পনা নিলেন গঙ্গা, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, গৌরীগঙ্গার বুকে। সুন্দরলাল বহুগুণা প্রমুখ প্রকৃতিবিদ প্রবলভাবে বিরোধিতা জানালেন। বহু NGO আন্দোলন করল। সাধুসন্তেরা অনশনাদির দ্বারা প্রতিক্রিয়া করলেন—'নর্মদা বাঁচাও'-এর আদলেই শুরু হল 'গঙ্গা বাঁচাও' আন্দোলন। ঘড়া ঘড়া দুধ দিয়ে অভিষিক্তা হলেন মা গঙ্গা। সৃষ্টি হল 'টিহরী বাঁধ বিরোধী সংঘর্ষ সমিতি', স্থানীয় নেতা V. D. Saklani-র অধ্যক্ষতায়। কিন্তু প্রবল বিরোধের মধ্যেই উদ্বোধন হল ভারতবর্ষের বৃহত্তম, পৃথিবীর উচ্চতম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র টিহরী ড্যাম ২০০৬ সালে,

যার উৎপাদন-ক্ষমতা একহাজার মেগাওয়াট। গাড়োয়ালের জেলা সদর টিহরী, প্রায় কুড়ি হাজার লোকের যেখানে বাস—প্রাচীন ঐতিহাসিক ওই শহর চলে গেল জলের তলায়। জলের নিচে রয়ে গেল সেই বিশাল রাজবাড়ি, clock tower, বাজার, জনপদ। সৃষ্টি হল নতুন শহর 'নই টিহরী'—সৃষ্টি হল প্রায় সত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ এক হ্রদ বা ঝিল। গৃহহারা বহু মানুষ পেলেন পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি...

কিন্তু যেটা স্পষ্ট অনুভূত হতে লাগল সকলের চোখেই—সেটা মা-গঙ্গার এক শ্রীহীন রূপ। গোমুখ উত্তরকাশী হয়ে টিহরীতে সুরধুনীর যে-উচ্ছলতা, বরফগলা জলের শীতলস্পর্শে ওই ভূখণ্ডের যে-স্নিগ্ধতা, শীতলতা ছিল তা অবলুপ্ত হল। কমপক্ষে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বৃদ্ধি হয়েছে উত্তরকাশী—ধরাসু—চিন্নালীসৌর অঞ্চলে। যে-চিকন সবুজ গাছপালা ছিল গঙ্গার দুপাশে তা নষ্ট হয়েছে। ড্যাম জল ছাড়লে তবেই গঙ্গাবক্ষ ভরে ওঠে, কিন্তু সে-শীতলতা আর নেই, নেই সেই ভেষজ জড়িবুটি-সুরভিত গঙ্গাজলের স্বাদ। বহু ধার্মিক, বহু সন্ন্যাসী যাঁরা পানীয় হিসেবে শুধুমাত্র গঙ্গাজলই পান করতেন তাঁরা বিরূপ হলেন। এখন অধিকাংশ সময়ে মা গঙ্গা উপলখণ্ডগুলির মধ্য দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেন মর্যাদাহীন ক্রন্দনের সুরে ক্ষীণগতিতে... ''আমার কণ্ঠ হতে কে নিল গান/ নিল ভুলায়ে...।''

প্রকৃতিদেবী তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছিলেন। ১৯৯১-তে উত্তরকাশীর মনেরী তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাছে 'ঝামক' গ্রাম ভেসে গেল প্রবল বর্ষণে ল্যান্ডস্লাইডে। ২০০৮-এ মনেরীর project II-এর উদ্বোধন হল, ধনারিপট্টী সহ তেরোটি জনপদ ল্যান্ডস্লাইডে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হল। উত্তরকাশীর ওই অঞ্চল গত কয়েক বছরে এক বিধ্বংসী রূপ নিয়েছে—বেড়ে গেছে বৃষ্টিপাত, বন্যা, ক্লাউডবার্স্ট এবং ল্যান্ডস্লাইড। ২০১০-এ উত্তরকাশীর প্রাচীন জনপদ ভটয়ারী-র বহু গ্রাম ভারি বৃষ্টি, ল্যান্ডস্লাইডে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিকটবর্তী লোহারী নাগ হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ওইসব অঞ্চলে পানীয় জলের স্তরও দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে এমন অভিযোগও উঠছে।

শুধু গঙ্গা নয়, বাঁধ তৈরি হচ্ছে এবং সহজ স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অলকানন্দা, ধৌলীগঙ্গা, মন্দাকিনী, গৌরী গঙ্গার স্রোতেরও। বদরিনাথে গোবিন্দঘাটের আশেপাশে দুধের মতো উচ্ছল অলকানন্দার রূপ আজ স্মৃতির সুধাসঞ্জীবনী। বিষ্ণুপ্রয়াগে JP-র বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে অলকানন্দা আজ এক ক্ষীণ মৃতপ্রায় স্রোতোধারা। এমনই শ্রীনগরে, যোশীমঠে (তপোবনে)-ও শুরু হয়েছে নতুন প্রকল্পগুলি। পাশাপাশি পরিবেশ সচেতন কিছু বিরোধী সংগঠনও গড়ে উঠছে—তাদের অভিযোগ আন্দোলন দিল্লি পর্যন্ত চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং সুপ্রিম কোর্ট সক্রিয় অংশ নিয়েছে এই প্রকল্প বিনিয়োগে। স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ : গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশী পর্যন্ত একশো ত্রিশ কিলোমিটার 'Eco-sensitive zone' ঘোষণা করা হয়েছে—নিষিদ্ধ করা হয়েছে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙা, পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি। গঙ্গাকে জাতীয় নদী ঘোষণা করা হয়েছে এবং তৈরি হয়েছে National Ganga River Basin Authority, যার অধ্যক্ষ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এতে অবস্থা হয়েছে আরও ভয়ংকর—পাহাড়ে প্রকল্পের কাজের জন্য যে-খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশে কাজ বন্ধ হয়ে থাকায় খানাখন্দগুলি মুখ হাঁ করে আছে। অফিসগুলিতে কর্মীরা অবসর বিনোদন করছেন কারণ কোনও কাজ নেই। অস্থায়ী কর্মী, যাঁরা অধিকাংশই স্থানীয় অধিবাসী, তাঁরা বরখাস্ত

হয়ে বসে আছেন—ফলে সামাজিক জীবনযাপনেও এসেছে এক অনিয়ন্ত্রিত অনিশ্চয়তা।

গত ৬ মে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বহুগুণা রাজ্যের কিছু বিধায়ককে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান—ওই 'Eco-sensitive zone'-এর বিলটির পুনর্বিবেচনা বা প্রত্যাহারের আর্জি নিয়ে। একই সঙ্গে আরও কিছু সমস্যার কথা এসে পড়ে—প্রত্যেক বছর অক্ষয়তৃতীয়া থেকে দীপাবলী পর্যন্ত প্রায় ছ-মাস যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-কেদার-বদরির (চারধাম)

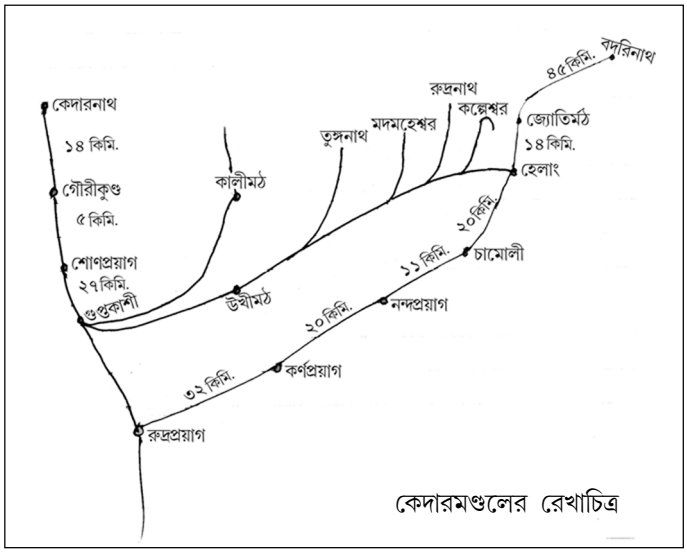

কেদারমণ্ডলের রেখাচিত্র

মন্দির খোলা থাকে। তাই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রা এটি—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে এবং বিদেশ থেকেও বহু তীর্থযাত্রী এই চারধাম দর্শন করতে আসেন। হরিদ্বার থেকে বদরিনাথ ৩২৫ কিলোমিটার, কেদারনাথ ২৪৯ কিলোমিটার (২৩৫+১৪)—এই পথের মান এত খারাপ যে গাড়ি চালানোর পক্ষে তা মোটেই নিরাপদ নয়। 'কেদার বদরি মন্দির সমিতি' এই যাত্রার সঞ্চালক কিন্তু এই দীর্ঘ পথের যাত্রীদের জন্য দুর্ঘটনার Relief measure, উদ্ধারকারী হেলিকপটার বা যথেষ্ট টয়লেট—কিছুই নেই। নেই স্থানে স্থানে যাত্রীদের সহায়তাকেন্দ্র, নেই ফার্স্ট এড সেন্টার বা আপদকালীন OPD। অথচ এই যাত্রাকে আমরা আন্তর্জাতিক মানের যাত্রার মর্যাদা দিচ্ছি—এবং অবশ্যই যাত্রীদের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এটা আন্তর্জাতিক মানের যাত্রা।

এতসব অব্যবস্থার মধ্যে যাত্রা চলছে, এবছরও যথারীতি এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেই খুলে গেল কেদারনাথ ও বদরিনাথের মন্দির মে মাসের ১৩ তারিখে। শুরু হয়ে গেল বাস, ভলভো, ট্রাভেলার থেকে শুরু করে বহু আকারের বহু মডেলের যানবাহনের মিছিল। কিছুদিনের মধ্যেই যাত্রিসংখ্যা ছাড়িয়ে গেল লক্ষের সীমা।

বর্ষার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, হঠাৎ ১৪-১৫ জুন সামান্য বৃষ্টি শুরু হল, সংবাদপত্র জানাল প্রাক্ মৌসুমী বর্ষা। ১৬ জুন ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল সারাদিন ধরে। ১৭ জুন সকালে গঙ্গাদর্শন করব বলে ঘরের বারান্দায় এসে দেখছি জল অনেক ওপরে উঠে এসেছে। ছাদে গেলাম অলকানন্দা দেখতে। দেখে শিউরে উঠলাম ভয়ে, এ কী ভয়ংকর রূপ! পোড়ামাটির মতো কালো কাদাঘোলা জল, সহস্রফণার মতো ঢেউ যেন ক্রোধে ফুঁসছে, উথালপাথাল করছে নদী... জলে ভেসে যাচ্ছে গাছপালা, কাঠের তক্তা, ভগ্ন গাড়ির বনেট! সংগমের ঘাটের কাছে জল প্রায় রাস্তা ছুঁই ছুঁই করছে।

সকাল নটায় দেখছি পুলিশ ভীত জনতাকে সাবধান করছে। বদরিনাথ মার্গে কোনও গাড়ি নেই—বাসস্ট্যান্ডে খালি বাস মুখ ঘুরিয়ে রাখা। বদরিনাথ মার্গের থেকে প্রায় একশো পঞ্চাশ ফিট ওপরে আমরা থাকি, রাস্তায় নেমে এসে দেখি

দেবপ্রয়াগ বাসস্ট্যান্ডে বহু লোকজন, পুলিশ। সামনেই পুলিশ চৌকি, থানা। দেখি, থানার সামনের বারান্দাতে এস পি বসে আছেন। জগদীশ প্রসাদজীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি, সদাহাস্যমুখ, তাঁকেও দেখলাম বিষণ্ণমুখে দায়সারাভাবে বিনম্র দৃষ্টি বিনিময় করলেন, বললেন, ''কেদারে ভোররাত্রে ক্লাউডবার্স্ট হয়েছে, মন্দাকিনী-অলকানন্দা ভেসে গেছে—রাস্তাঘাট বন্ধ। ওপরে নিচে কোনও গাড়ি চলছে না, বাজারে কিছু কেনার থাকলে এক্ষুনি কিনে নিন, এক্ষুনি দোকানপাট বন্ধ করে দেব।''

কিছু আনাজপত্র কিনে দ্রুত ঘরে ফিরে এলাম। রুদ্রপ্রয়াগে, গুপ্তকাশীতে ব্যক্তিগত পরিচিত মুখগুলির কুশল চাইছি ফোনে—একটাও ফোন পাচ্ছি না। কেদারনাথে অবস্থীজী-শর্মাজী আমাদের পরিচিত পান্ডা—বন্ধুলোক। কোনও যোগাযোগ করতে পারছি না। বারান্দায় বসে আছি, রুদ্ধশ্বাসে দেখলাম গঙ্গা-অলকানন্দার সংগম ডুবে গেল। জীবনে কখনও ভাবিনি এ-দৃশ্যও দেখতে হবে! জলস্তর প্রায় একশো ফিট ওপরে উঠে গেছে। রাস্তার ধারের বাসিন্দারা উঠে গেছে পাহাড়ের উঁচুতে—সংগমের আশেপাশের বাড়িগুলিতে দেড়তলা-দুতলা জল। ফোনে খবর পাচ্ছি শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগেরও একই অবস্থা। গুপ্তকাশী কালীমঠের ব্রিজ ভেঙে গেছে। ঋষিকেশ ত্রিবেণীঘাট ভেসে গেছে, বাজারের মুখে জল থইথই করছে।

দুপুর একটা নাগাদ মা-গঙ্গা তাঁর রুদ্ররূপ সংযত করে নিলেন। আকাশেও ফিকে রোদ্দুর দেখা গেল, জলস্তর নামতে শুরু করল। বিকেল তিনটে নাগাদ থানায় খোঁজ নিলাম, শুনলাম গৌরীকুণ্ড ভেসে গেছে, বহু যাত্রী মারা গিয়েছে কেদারনাথে।

পরদিন সকালে সংবাদপত্রে দেখলাম কেদারনাথের বিধ্বংসী লীলা—কেদারনাথ মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে। এমনও কথা কানে আসছে—শেষরাতে নাকি এক বিচিত্র বর্ণের রামধনু দেখা গিয়েছিল কেদারনাথের আকাশে, তার কিছুক্ষণ পরেই বিকট একটা শব্দ। অনেকেই ভেবেছিল ভূমিকম্প। কিছু না বুঝেই কেউ ছুটেছিল মন্দিরের দিকে, কেউ বা পাহাড়ের ওপরে... বিরাট একটা কড়াই উলটে গেলে যেমন হয়, তেমনভাবেই গান্ধিঝিলের জল অঝোরধারায় নেমে এসেছিল—পাথর, বালি, বোল্ডার সহ। অদ্ভুত এক বিশাল পাথর এসে মন্দিরের পিছনে আটকে গেল... মন্দির থাকল অক্ষত, অক্ষত থাকলেন নন্দীশ্বর... কিন্তু যাঁরা গিয়েছিলেন কেদারদর্শনে তাঁরা আর ফিরলেন না। লক্ষাধিক যাত্রী সেখানে ছিলেন—মৃতের সংখ্যা, নিখোঁজের সংখ্যার পরিসংখ্যান অর্থহীন। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী, কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছেন সেনাবাহিনির সহায়তায়, তাঁরা অধিকাংশই অভুক্ত, তৃষ্ণার্ত শরীরে দিনের পর দিন কাটিয়ে অসুস্থ, মানসিকভাবেও এক ট্রমায় আক্রান্ত।

এই বিপর্যয়ের জন্য সকলেই দোষারোপ করছেন অনিয়ন্ত্রিত ভূস্খলনের কারণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে, কেদারনাথের হেলিকপটারজাত শব্দদূষণকে, অতিরিক্ত যানবাহনের ফলে উৎপন্ন কার্বন-ধোঁয়া ইত্যাদির পরিবেশ দূষণকে। ভূতত্ত্ববিদ বা Ecologist-দের এটা গবেষণার বিষয়। কিন্তু সাধারণবুদ্ধিতে মনে হচ্ছিল সকল তীর্থযাত্রীই ইদানীং কেদার-বদরিতে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেন। অনেকেই বলছিলেন—আর না, অনেক হল। দু-এক দশক আগেও যাঁরা কেদারের নীরবতা অনুভব করেছেন, দেখেছেন কেদারের সেই সমাহিত রূপ, কল্লোলিনী মন্দাকিনী, তাঁরা জানেন, ক্রমশই সেসব হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সেই শান্ত নৈঃশব্দ্য...। এবং হারিয়ে যাচ্ছে সাধককুল, সাধুসমাজ। কেদারনাথের কিংবদন্তি মহাপুরুষ ফলাহারী বাবা বহুদিন গত হয়েছেন, ইদানীং কেদারে গেলেই সঙ্গ পেতুম পূজনীয়া

কৃষ্ণামাতাজীর (পাঞ্জাবি শরীর, দিল্লির এক নামি কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন, আনন্দময়ী মায়ের শিষ্যা), তিনিও গত হয়েছেন। বদরিনাথে কয়েকবছর আগেও ছিলেন অবধূত মহারাজ, বীণা মহারাজ, গুদরী বাবা, ভাগবতী মাতাজী—উচ্চতারে বাঁধা ছিল তাঁদের জীবন, জীবদ্দশাতেই পেয়েছিলেন দেবমানবের মর্যাদা—আজ সেসবও স্মৃতি।

ক্রমশ তার বদলে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে ভোগৈশ্বর্যের প্রাচুর্য। হোটেলের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে বিলাসবহুলতা, দোকানপাট বিপণন-সামগ্রীর সজ্জাসম্ভার। তীর্থ হারাচ্ছে তার চরিত্র... অবক্ষয় হচ্ছে শ্রদ্ধার। তীর্থও ট্যুরিজম ইনডাস্ট্রি-র মধ্যে পড়ে, ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ দেশ—ধর্মও পণ্য হতে পারে, কিন্তু তার চরিত্র আলাদা, আলাদা অধিকারী। তীর্থ পরাবিদ্যার ক্ষেত্র, এখানে সস্তা ইন্দ্রিয়বিনোদনের প্রদর্শনী হবে কেন? ওষুধের দোকানে কেউ কাপড়জামা বা মিষ্টি কিনতে যায় না। দুটো আলাদা ক্ষেত্র, আলাদা স্তর। স্বামীজী একদা বলেছিলেন, পাশ্চাত্যে কোনও রমণীয় স্থান হলে সেখানে হোটেল-পার্ক ইত্যাদি বিনোদনের স্থান হয়, আর ভারতে যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশি সেখানে হয় দেবালয়। আমরা উপেক্ষা করেছি সেই পরম্পরাকে, সেই ঐতিহ্যকে, সেই সত্যকে। কিন্তু এটা কঠোরতম সত্য, যে-সত্য নিজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কেদারনাথের সাম্প্রতিক বিপর্যয় সেই কঠোরতম সত্যকেই প্রমাণ করল।

এই প্রতিবেদনটি যখন প্রকাশিত হবে, জানি না, তখন কেদারনাথের পূজাভিষেক শুরু হয়ে যাবে কি না। কিন্তু এখনও কেদারনাথের পূজার শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। মনে পড়ছে শিবমহিম্ন স্তোত্রের একটি স্তবক—

''শ্মশানেষ্বক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু মামৈবমখিলং
তথাপি স্মৃতৃণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি॥''

বাহ্য শুদ্ধাশুদ্ধির অতীত সেই চির কাল্পনিক কেদারেশ্বরকে অনেক প্রণাম জানাই—

''বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমোঃ নমঃ।
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমোঃ নমঃ॥''

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হল

উপনিষদের অমৃত

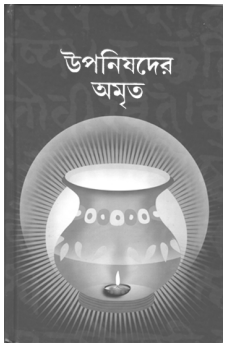

স্বামী বিবেকানন্দ বেদ-উপনিষদের শাশ্বত ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে। তাঁরই চিন্তাধারার অনুবর্তনে নিবোধত পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপনিষদীয় আলোচনার সূত্রপাত। 'উপনিষদের অমৃত' নামে দশবছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই মনোজ্ঞ উপনিষদচিন্তন বহুজনের অনুরোধে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। স্বামীজীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিবোধত পত্রিকার শ্রদ্ধার্ঘ্য এ-গ্রন্থটি শাস্ত্রামোদী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। মূল্য ১৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, সারদাপীঠ, উদ্বোধন কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।